বস্তুসার
(Abstract)

আমাদের গবেষণা অভিসন্দর্ভের নাম ‘শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস: বিষয়বৈচিত্র্য, জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি’। বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে বাংলা কথাসাহিত্যে পা রাখেন এক ঝাঁক তরুণ লেখক। যাঁদের জন্ম ও বালক-কৈশোর পর্ব কেটেছে পরাধীন ভারতবর্ষে। তাঁদের মধ্যে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় একজন অন্যতম কথাশিল্পী। দেশভাগের অস্থির সময়ে প্রায় সর্বস্ব হারিয়ে দশম শ্রেণির পড়াশোনা চলাকালীন এপার বাংলা অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে এসে উপস্থিত হন। তারপর বাংলা সাহিত্যে নিজের বিষয় নির্বাচন, স্বতন্ত্র জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতির মাধ্যমে নিজেকে একজন প্রথম শ্রেণির সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। লেখকের নিজের জীবন অভিজ্ঞতাই হয়ে ওঠে তাঁর উপন্যাসের কাঁচামাল। তাই লেখক বলেন, ‘‘ঘুরে ফিরে যার কথা লিখতে চেয়েছি সে আমারই জানাশুনো একজন লোক। তার নাম শ্যামল গাঙ্গুলি।’’ (জীবনরহস্য, পৃ. ১৮০) লেখার বিষয়বস্তু পাবার জন্য, গ্রামকে জানার জন্য ছুটে গিয়েছেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার ‘চম্পাহাটি’ অঞ্চলে। সেখানে পুরো পরিবারসহ বসবাস করেছেন, গ্রামের মানুষের সঙ্গে মিশেছেন, কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িয়ে গেছেন— আর খুঁটে খুঁটে সংগ্রহ করেছেন অভিজ্ঞতা। ‘চম্পাহাটি’ যেন লেখককে নতুন চোখ, নতুন ভাবনা, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দান করলো। এভাবেই আজীবন ধরে লেখক নিজের জীবনকে বারবার অনিশ্চয়তার মুখে ফেলেছেন, পরীক্ষা করেছেন ও বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছেন। আর তার ফলশ্রুতিতে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হল, আমরা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সৃষ্টিকর্ম নিয়ে কেন গবেষণা করব। কারণ আমরা মনে করি, উপন্যাসের অন্বিষ্ট শুধু সমাজ নয়, সময় নয়, ইতিহাসও নয়। উপন্যাসের অন্বিষ্ট ব্যক্তিমানুষ। আর এই সমাজ, সময়, ইতিহাস ব্যক্তিমানুষের চরিত্র ও মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক জটিল করে দেয়। তাই মানুষকে খুঁজতে গিয়ে এই সমাজ, সময় ও ইতিহাসকেও খুঁজতে হয়। এই গবেষণাকর্মের দ্বারা সেই সময়-সমাজকে, সময়-সমাজ দ্বারা বিধৃত মানুষকে যারা উদাসীন এক বিশ্বজগতে পরাজয় নিশ্চিত জেনেও মানবিক মর্যাদা রাখার জন্য শেষ অবধি তাদের চিন্তা-কল্পনা-আদর্শের জন্য যুদ্ধ করে যায়, তাদের আলোকিত করব। নিশ্চিত পরাজয়, নিয়তির পরিহাসকেও পরাজিত করে মানুষের অদম্য জীবন-তৃষ্ণা, রহস্য আবিষ্কারের অনাবিল আনন্দ,

প্রতিশ্রুতি— এই জীবনবাদী মানসিকতা, আশাবাদী মনোভাব বর্তমান অস্থির সময়ে খুবই প্রাসঙ্গিক। আর তাছাড়া শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় সমকালীন ও পূর্বকালীন লেখকদের তুলনায় নানা বিষয়ে অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এই সব অভিনবত্ব তুলে ধরে তিনি বাংলা সাহিত্যকে কতটা সমৃদ্ধ করেছেন— সে বিষয়ে মূল্যায়নের চেষ্টা করা হবে। এইসব কারণে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনাকর্ম বিষয়ে গবেষণা করা অত্যন্ত জরুরী বলে মনে হয়েছে।

আমাদের আলোচ্য গবেষণা প্রকল্পটিকে আমরা নিম্নোক্ত কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে গবেষণায় এগিয়ে যাওয়ার কথা ভেবেছি।

প্রথম অধ্যায় : শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের বিষয়বৈচিত্র্য

দ্বিতীয় অধ্যায় : শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ে উপন্যাসে প্রতিফলিত জীবনদৃষ্টি

ক) উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ও ঘটনা, প্রসঙ্গ অবলম্বনে জীবনদৃষ্টি।

খ) উপন্যাসের গৌণ চরিত্র ও ঘটনা, প্রসঙ্গ অবলম্বনে জীবনদৃষ্টি।

তৃতীয় অধ্যায় : শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে সময়, সমাজ ও ঐতিহ্য

চতুর্থ অধ্যায় : শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের শিল্পরীতি

ক) গঠন নৈপুণ্য

খ) উপস্থাপনা রীতি

গ) ভাষা বিন্যাস

উপসংহার : শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের সামগ্রিক মূল্যায়ন

গ্রন্থপঞ্জী : আকর গ্রন্থাবলী ও সহায়ক গ্রন্থাবলী

প্রথম অধ্যায়

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের বিষয়বৈচিত্র্য

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসের জগতে বহু বিষয় তুলে ধরেছেন। আসলে লেখকের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার খুব সমৃদ্ধ। লেখকের জীবন-কথা তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এই বিপুল অভিজ্ঞতার সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে উপন্যাসের যে জগৎ তিনি তৈরি করলেন তা বিষয়বৈচিত্র্যে ভরপুর। স্থানিক পটভূমির দিক থেকে মোটা দাগে তাঁর উপন্যাসগুলোকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়।

এক. গ্রাম ও মফস্বলকে পটভূমি করে রচিত উপন্যাস।

দুই. শহর ও নগরকে পটভূমি করে রচিত উপন্যাস।

যদিও এই দুই পটভূমি ব্যতীত বিশেষ কোনো অঞ্চলকে কেন্দ্র করেও উপন্যাস লেখা হয়েছে। এই বিষয়টি যথাসময়ে যথাযোগ্য স্থানে আলোচিত হবে। লেখকের 'চম্পাহাটি পর্ব' (১৯৬৫-১৯৭১) গ্রামজীবনের অভিজ্ঞতার আকরভূমি। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার চম্পাহাটিতে ১৯৬৫ সালের ১১ই অক্টোবর থেকে বসবাস শুরু করেন। গ্রামে বড়ো হয়ে ওঠা নয়, কিশোর বয়সের স্মৃতি নয়; শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় গ্রামকে দেখলেন, জানলেন, বুঝলেন একদম তরুণ বয়সে। রবীন্দ্র-শরৎ-তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণের দেখা গ্রামজীবন থেকে একেবারে স্বতন্ত্র গ্রামজীবন তুলে ধরলেন লেখক। এছাড়া মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, বীরভূম জেলার নানা গ্রাম ও মফস্বল অঞ্চল এবং বাংলাদেশের খুলনা জেলার গ্রামজীবন উঠে এসেছে লেখকের উপন্যাসগুলোতে।

গ্রামজীবনকে অভিজ্ঞতা করে তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হলো, 'কুবেরের বিষয় আশয়' (১৯৬৭), 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' (১৯৭৬), 'স্বর্গের আগের স্টেশন' (১৯৮০), 'চন্দনেশ্বর জংশন' (১৯৮০) ইত্যাদি উপন্যাস। শহরজীবনকে পটভূমি করে লেখা উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হলো, 'বৃহন্নলা' (১৯৬১), 'আবিষ্কার' (১৯৭৭), 'হাওয়াগাড়ি' (১ম খণ্ড-১৯৭৯ ও ২য় খণ্ড-১৯৮০) ইত্যাদি উপন্যাস।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলো কাহিনির পটভূমিরূপে মূলত গ্রাম ও নগরজীবনের চেনা পরিবেশ ব্যবহৃত হলেও এমন অনেক উপন্যাস রয়েছে যেখানে আমরা দেখতে পাই কিছুটা অল্প-পরিচিত বা অচেনা পটভূমি। এই উপন্যাসগুলোতে ঐ অঞ্চলগুলোর বিশেষত্ব কাহিনিগুলোর মধ্যে স্বতন্ত্র জায়গা করে নিয়েছে। যেমন— 'পরীর সঙ্গে প্রেম' (ডুয়ার্সের চা বাগান), 'মহাজীবন' (আসানসোলের কয়লাখনি অঞ্চল), 'স্বর্গে তিন পাপী' (কোনারক), 'একদা ঘাতক' (পুরী), 'এক সিংহ ও তার রমণী' (গির অভয়ারণ্য), 'বড় হওয়ার আগে' (শান্তিনিকেতন), 'সুধাময়ীর দিনলিপি' (কালাহাণ্ডি), 'কহেল গাঁও' (সাওতাল পরগণা)।

বঙ্কিম পরবর্তী সময়ে মোঘল রাজবংশের এক শাহজাদাকে নিয়ে লিখেছেন, লেখকের বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস 'শাহজাদা দারাশুকো' (১ম খণ্ড-১৯৯১ ও ২য় খণ্ড-১৯৯১)। নদী ও নদী তীরবর্তী মানুষজনের কাহিনি উঠে এসেছে 'গঙ্গা একটি নদীর নাম' (২০০১)।

কলকাতা শহরের অন্যতম একটি অঙ্গ হলো গ্রুপ থিয়েটার। এই গ্রুপ থিয়েটার ও থিয়েটার

সংশ্লিষ্ট চরিত্রদের নিয়ে লিখেছেন 'অদ্য শেষ রজনী'। বাংলা সাহিত্যে এর আগে এই বিষয় নিয়ে কোনো উপন্যাস রচিত হয়নি। ভবিষ্যতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতি সত্ত্বেও মানুষের আত্মহত্যা করার প্রবণতা ছোঁয়াচে রোগের রূপ নেবে। এই বিষয়ে নিয়ে লিখছেন 'নতুন ভুবন' উপন্যাসটি। মানুষের রাতারাতি বড়লোক হবার অন্তহীন লোভকে হাতিয়ার করে কীভাবে চিটফাণ্ড সাধারণ মানুষকে বোকা বানায়, সর্বশান্ত করে— এই বিষয় নিয়ে লিখেছেন 'সওদাগর' উপন্যাস। বিষয়বৈচিত্র্যে শ্যামলের রচনাসম্ভার যে অনেক সমৃদ্ধ, তা আমরা আমাদের গবেষণা পত্রের প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে প্রতিফলিত জীবনদৃষ্টি

আমরা লেখক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সামগ্রিক জীবনদৃষ্টি তুলে ধরে, তা উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্র কিংবা বিভিন্ন ঘটনা বা প্রসঙ্গ অবলম্বনে কীভাবে ফুটে উঠেছে তা দু'ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করব। যথা —

ক) উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ও ঘটনা, প্রসঙ্গ অবলম্বনে জীবনদৃষ্টি।

খ) উপন্যাসের গৌন চরিত্র ও ঘটনা, প্রসঙ্গ অবলম্বনে জীবনদৃষ্টি।

ক) উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ও ঘটনা, প্রসঙ্গ অবলম্বনে জীবনদৃষ্টি:

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় জীবনকে যতটুকু দেখেছেন, জেনেছেন; সেটুকু খুব নিবিড়ভাবে কাছ থেকে দেখা ও জানা। আর সেই অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে তাঁর এই উপন্যাসগুলো। এজন্য তাঁর উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলো মাটির এত কাছাকাছি, এত সজীব ও সরস। তাই এই চরিত্রগুলো ঘিরেই প্রকাশিত হয়েছে লেখকের জীবন-ভাবনা বা জীবনদৃষ্টি। জীবনদৃষ্টি বলতে এখানে আমরা বুঝিয়েছি জীবনকে তিনি যে দৃষ্টিতে দেখেছেন, জীবন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা কিংবা অনুভব বা উপলব্ধি। লেখক নির্মিত চরিত্রে কাজ করেছে এক অপরাজেয় মানসিকতা। অত্যন্ত বিপর্যস্ত সময়েও হার না-মানার মানসিকতা। তাই 'কুবেরের বিশয় আশয়' (১৯৬৭) -এর কুবের, 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' (১৯৭৬)-র অনাথ, 'স্বর্গের আগের স্টেশন' (১৯৮০)- এর খগেন নস্কর কিংবা 'চন্দনেশ্বর জংশন' (১৯৮০) -এর বজরা প্রমুখ আরও অনেক চরিত্রের মধ্যে প্রতিফলিত হয়

অপরাজেয় জীবন-তৃষ্ণা। উদাসীন এক বিশ্বজগতে পরাজয় নিশ্চিত জেনেও মানবিক মর্যাদা রাখার জন্য শেষপর্যন্ত তারা চিন্তা-কল্পনা-আদর্শের জন্যে যুদ্ধ করে যায়। অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এই যাত্রা।

খ) উপন্যাসের গৌণ চরিত্র ও ঘটনা, প্রসঙ্গ অবলম্বনে জীবনদৃষ্টি :

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের জগতে প্রধান চরিত্রের পাশাপাশি অপ্রধান বা গৌণ চরিত্রদেরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। আমরা এখানে গৌণ চরিত্র বলতে পাঠগত আধিপত্য বা উপস্থিতির সাপেক্ষে মূল্যায়ন করেছি। মূল কাহিনিতে একটি চরিত্রের উপস্থিতি বা কার্যকলাপ অংশের নিরূপণ করে নায়ক বা নায়িকা চরিত্র ব্যতিত অন্যান্য চরিত্রগুলোকে গৌণ চরিত্রের শ্রেণিগত বিভাগে রেখেছি। এইসব চরিত্ররা কখনো নায়ক চরিত্রে প্রতিফলিত জীবনদৃষ্টিকে পরিপুষ্ট দান করেছে কখনো বা স্বতন্ত্র জীবনদর্শনের আভাস দিয়েছেন। যেমন, 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস' উপন্যাসের অবিনাশ, 'কুবেরের বিষয় আশয়' উপন্যাসের ব্রজ ফকির, 'নির্বান্ধব' উপন্যাসের অনিল দত্ত প্রমুখ।

তৃতীয় অধ্যায়
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে সময়, সমাজ ও ঐতিহ্য

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসেও আমরা এই সমাজ, সময় ও ঐতিহ্যকে খুঁজে পাব। যেখানে বিধৃত হয়ে আছে ব্যক্তিমানুষ। পঞ্চাশের দশকে যখন লেখালেখির জগতে তাঁর আবির্ভাব ঘটল তখন ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর সবেমাত্র পথ চলা শুরু করেছে। কিন্তু কিছু কিছু মানুষের 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়', ভারত-চীন ও ভারত-পাকিস্থান যুদ্ধ, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক জটিলতা সাধারণ মানুষকে বিপর্যস্ত করে তোলে। উদ্বাস্তু ও ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা তখন পশ্চিমবঙ্গের জীবন্ত দুই আগ্নেয়গিরি যা থেকে ক্রমশ রাগ, ক্ষোভ, হতাশা, ঘৃণা, নিঃসঙ্গতা, বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদির মত লাভা উদ্‌গীরণ হতে থাকে। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় নিজে এই সমাজ ও সময় দ্বারা গভীরভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন। আর এই অভিজ্ঞতার কথাই লেখক বলেছেন তাঁর উপন্যাসে। তিনি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মাটি, মানুষ, ইতিহাস— সব ছিঁড়ে খুঁড়ে দেখেছেন এবং লিখেছেন। এভাবেই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে আমরা ছুঁতে পাই সময়-সমাজ-ঐতিহ্যকে। যা আমাদের বর্তমান সময়কে বুঝতে খুব সাহায্য করে। উপন্যাসের এই বিশেষ দিকটি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা গবেষণার মাধ্যমে আমরা তুলে ধরব।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের শিল্পরীতি

যে কোনো লেখকের রচনা বিশ্লেষণ করতে গেলে তার শিল্পরীতি নিয়ে আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলোর শিল্পরীতির আলোচনা কয়েকটি দিক থেকে করব। যথা—

ক) গঠন নৈপুণ্য

খ) উপস্থাপনারীতি

গ) ভাষা বিন্যাস

পৃথিবীর যেকোনো শিল্পই বিশিষ্ট হয়ে ওঠে তার শিল্পরীতির মধ্য দিয়েই। একমাত্র শিল্পরীতিতেই লেখকের প্রতিভা, কৃতিত্ব প্রকাশিত হয়। কারণ ভাব ও বিষয় স্থান-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ কিন্তু রীতিকেই আমরা একমাত্র বলতে পারি ব্যক্তি-বিশেষের উপর নির্ভরশীল। আর শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ভাব ও বিষয় দ্বারা রীতিকে আচ্ছন্ন করে সৌন্দর্য সৃষ্টির মাধ্যমে পাঠককে আনন্দ দান করা।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের মূল্যায়নে তাই শিল্পরীতির আলোচনা অনিবার্য হয়ে ওঠে। আর আমরা তো জানি, শিল্পের ইতিহাস আসলে তো শিল্পরীতির ইতিহাস। বিষয়বস্তু, জীবন দৃষ্টি, সময়-সমাজ-ঐতিহ্য ইত্যাদি যে পদ্ধতিতে লেখক একটা শিল্প সংরূপের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন, তাতে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে বাংলা কথাসাহিত্যে একজন প্রথম শ্রেণির সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। আমরা এই অধ্যায়ে শিল্পরীতির কয়েকটি দিক থেকে লেখকের কিছু উল্লেখযোগ্য নির্বাচিত উপন্যাস অবলম্বনে লেখকের শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করব। তিনি যে কৌশলগুলো অবলম্বন করে উপন্যাস নামক শিল্প সংরূপটি নির্মাণ করেছেন— তার গোপন স্বভাবটি পাঠকদের সামনে উদ্‌ঘাটিত করার চেষ্টা করব। সৌন্দর্যের অন্তর্নিহিত বিন্যাসকে বিশ্লেষণ করে দেখব— কীভাবে তা পাঠকের মনের মধ্যে রস সঞ্চার করে আনন্দ দান করতে সমর্থ হয়েছে।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস মূলত চরিত্রপ্রধান। আর উপন্যাসে আত্মজৈবনিক উপাদানের অধিক ব্যবহারের জন্য উপন্যাসের প্লট নির্মাণে যৌগিক প্লটের প্রাধান্য দেখা যায়। লেখকের বেশিরভাগ উপন্যাসের কাহিনি শুরু হয় মাঝখান থেকে। আবহ রচনা লেখকের উপন্যাসে বেশি দেখা যায় না। তিনি কোনো কোনো উপন্যাসে কিছু বাক্য ধ্রুবপদের মত ব্যবহার করেছেন। ভাষার

ক্ষেত্রে সাধারণত আটপৌরে শব্দ, ইংরেজি শব্দের মানানসই ব্যবহার বাক্যে করেছেন। জটিল বাক্য অপেক্ষা সরল বাক্যের প্রয়োগ বেশি। বর্ণনা করেছেন অনেকটা সংবাদপত্রে রিপোর্ট লেখার মত করে। উপমা, চিত্রকল্প, মিথ-পুরাণের ব্যবহারে তিনি নিজস্ব শিল্পরীতি তৈরি করেছেন।

উপসংহার

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন লেখক। এক জটিল সময়ের প্রেক্ষাপটে যুগ-জীবনকে বস্তুনিষ্ঠভাবে তিনি উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। জীবনের প্রতি অপার ভালোবাসা, কৌতূহল, বিস্ময়, বানাবার ইচ্ছা ইত্যাদির মাধ্যমে এক চলমান জগতের কথা, জীবনের কথা তুলে ধরেছেন। তাঁর জীবনদৃষ্টি, সময়-সমাজ-ঐতিহ্য যেভাবে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন, তাতে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে। বিষয়বৈচিত্র্য, জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতির নিরিখে তাঁর উপন্যাসের সামগ্রিক মূল্যায়ন করা আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।